ISSN : 3006-449X
INTERNATIONAL JOURNAL OF DIVERSE DISCOURSES

Published by: Centre for Academic Research and Development

An Open Access, Widely Indexed, Peer Reviewed Referred Journal
Vol. 2, No. 2, December 2025

লোকবিশ্বাস ও লোকাচারের মেলবন্ধনে ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন

ড. সঞ্জয় পাল[1]*
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।
Corresponding Author: ড. সঞ্জয় পাল, snjapdu@gmail.com

ARTICLEINFO

Keywords: রাষ্ট্র, মুক্তিযুদ্ধ, লোকাচার, সমাজপতি, পুরুষতান্ত্রিক, প্রতিবন্ধকতা, অমঙ্গল, অলুক্ষণে।

Received : 04 January 2025
Revised : 14 November 2025
Accepted: 15 December 2025

©2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

ABSTRACT

লোকসংস্কৃতি ও লোকাচার একে অন্যের পরিপূরক। সাম্প্রতিককালে লোকসংস্কৃতি নিয়ে নতুনভাবে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে। লোকবিশ্বাস, লোকাচার সবকিছুই লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। বহুদিন সযত্নে লালিত-পালিত মানুষের লোকবিশ্বাস নিয়ে সেলিনা হোসেন তাঁর উপন্যাসে আলোচনা করেছেন। মানুষের মনে কুসংস্কার কিভাবে প্রভাব ফেলেছে, তাদের প্রাত্যহিক জীবন কিরূপ পরিবর্তিত হয়েছে তা তিনি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। বর্তমানকালে যেখানে বিজ্ঞানকে ধরে আমরা ক্রমশ এগিয়ে চলেছি। অনেক প্রত্যন্ত গ্রামে যেখানে জ্ঞানের আলো প্রবেশ করেনি, তাদের বোধ, বিবেচনা বোধকে জাগ্রত করার জন্যই, তিনি এসব উদাহরণ তুলে ধরে, সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন।

সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। শুধু উপন্যাসের মধ্যেই তাঁর পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়, তিনি একাধারে কথা সাহিত্যিক গবেষক এবং প্রাবন্ধিক। সাহিত্যিকের আয়নাতে প্রতিবিম্বিত হয় একটা জাতি তথা একটা রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ জীবন প্রণালী। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি প্রতিফলিত হয় তাঁর সাহিত্যে। জীবনের গভীর উপলব্ধির প্রকাশকে সেলিনা হোসেন শুধু কথা সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। সঙ্গে যুক্ত করেছেন শক্তিশালী গদ্যের ব্যবহার। প্রত্যেক সাহিত্যিকের সাহিত্যের মধ্যেই থাকে প্রকৃতি, রাজনীতি ধর্ম সমাজ ইত্যাদি। সেগুলি সেলিনা হোসেনের উপন্যাসের মধ্যেও বিদ্যমান। এছাড়াও ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাও বেশ কয়েকটি উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন। এছাড়া কিছু উপন্যাসে লোকসংস্কৃতি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয়, সেলিনা হোসেনের নির্বাচিত উপন্যাসে লোকবিশ্বাস ও লোকাচারের প্রসঙ্গ। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা লোক বিশ্বাস সম্পর্কে একটু অবহিত হওয়ার চেষ্টা করতে পারি। ইংরেজি Folk belief এর বাংলা প্রতিশব্দ হল লোকবিশ্বাস। লোকবিশ্বাস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রথিতযশা লেখক বলেছেন –

> The attitude of mind in which perceptions are regarded as real judgement as true or matters fact actions and events as above to have certain result. It is a series and respectful attitude; for matter of fact compels us to adjust our behaviour to it, wheather we have power to alter it or not. (মফিজুল ৭১)

লোকবিশ্বাস মূলত লোকসংস্কারের একটি স্তর মাত্র। কারণ লোক বিশ্বাসে কোন বিশেষ বস্তু ঘটনা বা মানসিকতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একটি বিশ্বাস একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মনে যতক্ষণ অবস্থান করে, ততক্ষণ তা লোক বিশ্বাস বটে। ওপরের প্রদত্ত সংজ্ঞায় বিশ্বাসের স্বরূপ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। মনের কোন বিশেষ অবস্থায় এবং কেমন করে মানুষের মনে বিশ্বাসের ভিত পাকাপোক্ত হয়, সংজ্ঞাটিতে তার পরিচয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা কোনক্রমেই গৌণ নয়, কারণ তাকে নিয়েই সমাজ। সমাজে ব্যক্তির অবস্থান ভূমিকায় মুখ্য।

ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী আবার লোকবিশ্বাস সম্পর্কে মত প্রকাশ করে লিখেছেন- "সংহত এক জনসমষ্টি যে বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য -অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে, যেগুলির সঙ্গে শুভাশুভ বোধ জড়িত, তাই হল লোক বিশ্বাস" (চক্রবর্তী ৯৫) । মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই সংস্কার মানব মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। সংস্কার উদ্ভবের মূলে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে ধর্মীয় অনুশাসন ও আচারের, তা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের মানসিক দুর্বলতা, অনিশ্চয়তা থেকেই লোকবিশ্বাসের উদ্ভব। পৃথিবীর সব জায়গাতেই লোকবিশ্বাস প্রচলিত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে –

> কোন কোন সময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অযৌক্তিক ব্যাখ্যা কিংবা কোন সময় নৈসর্গিক নিয়ম সম্পর্কে পরিপূর্ণ অজ্ঞতার ফলেই সমাজে নানা লোক বিশ্বাসের জন্ম হয়। (ভট্টাচার্য ৭২)

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার লোক সমাজের প্রতিদিনের ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। অনেক বিশ্বাস এবং সংস্কার সাধারণ দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য কিংবা অর্থহীন মনে হলেও এমন অনেক লোক বিশ্বাস ও সংস্কার প্রচলিত আছে যেগুলির ক্রিয়া -প্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অজ্ঞতা ও অযৌক্তিক ব্যাখ্যার ভিত্তিভূমি হল গ্রামীণসমাজ। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের মন থেকে লোকবিশ্বাস দূরীভূত হয়। লোকসমাজে লোক বিশ্বাস বংশ পরম্পরায় সম্প্রসারিত হয়ে এসেছে। লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান যেমন আমরা লোকসমাজে পাই, ঠিক তেমনি বাংলা কথাসাহিত্যের মধ্যেও লোকসংস্কৃতির উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেলিনা হোসেন লোক জীবনকে কেন্দ্র করে বা লোক জীবনকে প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করে বহু উপন্যাস রচনা করেছেন, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উপন্যাস নির্বাচন করে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হব।

সেলিনা হোসেনের 'জলোচ্ছ্বাস' (১৯৭২) একটি অন্যতম উপন্যাস। এই উপন্যাসের পরতে পরতে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায় বাঙালির চর ইউনিয়নের করম আলির স্বভাবটা জংলি। তার বয়স ২৮ বছর। একদিন ঝড়ের রাতে নৌকা করে পটুয়াখালি থেকে ফেরার সময় আগুন মুখায় তলিয়ে যায় তার বাবা। তার সঙ্গে মারা যায় দাদি, বড় ভাই, ভাবি, ছোট বোনের স্বামী। আশ্চর্যজনকভাবে ভাইয়ের ছেলে বেঁচে যায়। উপন্যাসে লোকবিশ্বাস করম আলির মা'র মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে - "বাবার হাতটা টেনে নিয়ে বলেছিল, আইজ যাওনের কাম নাই বাবা করমআলিকে বা হাতটা টেনে না করেছিল আজ যাওনের কাম নাই বাবা। ক্যান? আপনের শরীল খারাব? না রে, আমার ডাহিন চউকটা ফড়কে" (হোসেন ১৫) ।

এখানে আমরা দেখতে পাই করম আলির মার ডান চোখটা কিসের যেন ইঙ্গিত দিচ্ছিল, এটা একটা লোকবিশ্বাস। গ্রামবাংলা এখনো লোকমুখে শোনা যায় ডান চোখ কাপলে নাকি অমঙ্গল ঘটে। তাছাড়া বাড়ি থেকে কেউ যদি কোন জায়গায় যায়, সেই মুহূর্তে কেউ যদি কাশি বা হাঁচি দেয় তাহলে অমঙ্গলের কারণ হয়। তখন সেই ব্যক্তি রওনা না হয়ে, একটু বসে গেলে নাকি অমঙ্গল কেটে যায়। আর যদি এই কাশি, হাঁচি শুনেও কেউ বাড়ি থেকে রওনা দেয়, তাহলে কোন না কোন অঘটন ঘটতে পারে। এই লোক বিশ্বাসটি গ্রামবাংলায় এখনো প্রচলিত। আবার অনেকে শুভ কাজে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দুটি নাক দিয়ে সমানভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলছে কিনা দেখে নেয়। যে পাশের নাক দিয়ে বেশি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলে, দিকের পা সামনে দিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। এই লোকবিশ্বাসগুলি লোকসমাজে বিদ্যমান। বর্তমান কালে দাড়িয়েও এখনও তা লক্ষ্য করা যায়। মানুষ কিন্তু এখনো এগুলোকে মানে কারণ, তারা নিজে থেকে পরিবারের কোনো ক্ষতি হোক সেটা চাই না। আর উপন্যাসে করম আলি তার মায়ের কথা অবজ্ঞা করে সবাইকে নিয়ে নৌকোয় উঠেছিল বলে সে এই অবস্থার শিকার হয়েছিল।

আবার করম আলির বোন সেদিনের ঘটনায় নিজেকে দায়ী করে। কারণ -"সেদিন আতা গাছের ওপর কাগটা পাখা উঁচু করে বারবার উড়ছিল, অথচও তাড়ায়নি" (হোসেন ১৫) । সেদিন সে যদি কাকটিকে

আতাগাছ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতো তাহলে হয়তো এমন ঘটনা ঘটত না, এমনই তার বিশ্বাস। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এইসব কথা পুরোটাই মনকে সান্তনা দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু করম আলির বোন আকাশি যেন মনে করেছে যে কাক তাড়ালে এমন অঘটন ঘটতো না। এমন অসংখ্য টুকরো টুকরো লোকবিশ্বাসের চিত্র উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে। অন্য একটি জায়গায় দেখা যায় করম আলির মা ভাত রান্না করছে, আর আকাশি পাশে বসে মাছ কাটছে। সে মাছ কাটতে কাটতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে —"মা তুমি কইছিলা না কলাগাছগুলি যুদি গেরস্তের ঘরের দিকে ঝুইলা কলা ছাড়ে তাইলে গেরস্তের ক্ষেতি অয়" (হোসেন ১৫) ?

উপন্যাসে কারো ঘরের চালের উপরে যদি কলা গাছ ঝুলে থাকে তাহলে ওই বাড়ির অমঙ্গল হয়। আকাশি একদিন সাজেদার বাগানে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে যে কলাগাছ ঝুলে আছে। এটাই আকাশি তার মাকে বলে। তাদের বিশ্বাস হয়তো তার জন্যই সেদিন করম আলি যখন সবাইকে নিয়ে নৌকায় উঠেছিল, এই কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। সাধারণত আমরা জানি যে গাছগুলিতে কলা ধরেছে সেই সমস্ত গাছগুলি তো একটু ঝুলেই থাকবে। কারণ কলাগাছ খুব শক্ত নয় যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাছাড়া কলার ওজন আছে। স্বাভাবিক কারণেই তাই কোন না কোন দিকে তাকে ঝুলে থাকতে হবেই, এটাই নিয়ম।

ঔপন্যাসিকের পরবর্তী উপন্যাস 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬)। এই উপন্যাসেও নানা লোকবিশ্বাস চোখে পড়ে। গফুর যখন মাছ ধরছিল তখন বুড়ি তার উদ্দেশ্যে বলেছিল- "মাছ মারতে এলে তুমি কামড়ে কামড়ে শালুক খাও। শালুক না খেলে নাকি তোমার মাছ ধরার নেশা জমে ওঠেনা" (হোসেন ১৩) । মাছ ধরার সময় বুড়ি নানা কথা গফুর কে বলে। গফুর বুড়ির কথার উত্তর দিতে দিতে গলা দিয়ে শব্দ বের হয় না। গফুরের শব্দ শুনতে ভালো লাগেনা। সে একটু নিরিবিলি থাকতে চাই। বুড়িকে যদি তার সঙ্গে সে নিয়ে আসে তাহলে আর তার মাছ ধরা হয়ে উঠবে না। প্রাত্যহিক জীবনে এমন লোকবিশ্বাস এক একজনের এক এক। যেটা মানুষ নিজের প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনেই সৃষ্টি করে নেয়। এর প্রধান কারণ মানুষের নিরক্ষরতা। উপন্যাসের অন্য জায়গায় দেখা যায় বুড়ির যেখানে মন চাই সে সেখানে চলে যায়। এখন সে বড় হয়েছে তবু বেলা এবং অবেলার তার জ্ঞান নেই। তাই প্রতিবেশীরা খোঁচা দিয়ে বলে –

> অমন ধিঙ্গি মেয়ে ধেই ধেই করে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ালে পোলাপান হয় নাকি? হাওয়া বাতাস বলে একটা জিনিস আছে না? বেলা- অবেলা আছে না? মেয়ে মানুষের সব সময় সব জায়গায় যাওয়া ঠিক নাকি? (হোসেন ১৩)

উপরের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় মেয়েদের চলাফেরা নিয়েও যে প্রতিবন্ধকতা সমাজে ছিল তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজপতিরা এমন কিছু কিছু নিয়ম ওরা নিজেরা বানিয়ে ফেলে যাতে করে মেয়েদেরকে ঘরে আটকে রাখা যায়। এটা এক ধরনের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উদাহরণ। পুরুষেরা মহিলাদের ওপর জোর খাটাতে পারে। কোনমতেই যেন পুরুষদের থেকে ওরা উপরে উঠতে না পারে তাই এই লোকবিশ্বাসগুলি। তাছাড়া একজন যুবতী মেয়ে যদি চারিদিকে এভাবে লাফালাফি, ছুটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে কখন

কি অঘটন ঘটে যেতে পারে তার কোন ঠিক নেই। হতে পারে পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙে গেল চিকিৎসা করার তার টাকা নেই। যার চিকিৎসা করার টাকা নেই সেই মেয়ের বিয়ে দিতেও সমস্যা তৈরি হয়। এইসব নানা কথা চিন্তা করে লোকবিশ্বাসগুলো সমাজে ভিত গেড়ে বসে আছে।

'পদশব্দ' (১৯৮২) সেলিনা হোসেনের আরেকটি উপন্যাস। এই উপন্যাসে আমরা সালমা, সাবিক,মিতালি,রকিব, নাসিমা, সাব্বির, জলিল, সালমার বাবা-মা প্রভৃতি চরিত্রগুলোকে পাই। চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখি যে, সালমার বাবা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। যিনি দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। আর সালমাও দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করে। আর নাসিমাও বিশ্ববিদ্যালয় সাইকোলজি পড়ান। সাবিক পড়াশোনা করে তার বন্ধু হল মিতালি। আরেক দিকে নাসিমা তার আগের স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে সাব্বিরের সাথে একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তারা বিয়েও করে। তেমনি রকিবকে সালমা ভালোবাসে। তাদের কেউ উপন্যাসের শেষের দিকে দেখা যায় বাড়িতে না জানিয়ে তারা বাড়ি থেকে চলে যায়। রকিবের সাথে বিয়ে করে। উপন্যাসে সালমার কাছে তার বাবার ভূমিকা খুব একটা ভালো ছিল না। সালমা ক্ষমতার দাপট আর দম্ভ নিয়ে চলতো। সে বলেছে–

> আমাকে জন্ম দিয়েছে বাবা। সে জন্মের শোধ তুলতে চেয়েছিল তোমার প্রভুত্বর জাতাকলে আমাকে পিষ্ট করে। কিন্তু তুমি কি জানো বাবা যারা দাস হয়ে জন্মায় তারা কোনদিন প্রভু হতে পারেনা? তুমি এই মূলটা ধরতে পারনি। প্রভু হবার আজীবন সাধনা করে তুমি চিরকাল দাস মনভাব নিয়ে কাটিয়ে দিলে। (হোসেন ১৩)

সালমা চেয়েছিল তার বাবা শক্তিমান পিতা হবে, একজন মহৎ পিতা হবে। যার দয়ায় দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্বকে মহান বলে সে অনুভব করতে পারবে। তাতে সালমার আত্মচেতনা চিরকাল প্রদীপ হয়ে জ্বলতো। কিন্তু তা না হওয়ার জন্য সালমা বাবার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। তার বাবার উদ্দেশ্যে সে বলেছে – "তোমার ব্যর্থতাকে আমি নিজে অতিক্রম করব বলে পথে নেমেছি তোমার কাছে কোনোদিন পৌঁছোবে না আমার সে পদশব্দ" (হোসেন ১৩) ।

সালমা ঘুমিয়েছিল, তার মা একবার তাকে ডেকে গেছে, আবার একটু পরে এসে তাকে ডেকেছে। কিন্তু সালমা তার মায়ের ডাকে সাড়া দেয় না। ওর কাছে মায়ের কণ্ঠ ভীষণ কর্কশ শোনায়। এমনকি দয়া মায়াহীন নিষ্ঠুর জল্লাদের মতো শোনায়। সালমা এমন করে বলে মা রেগে দরজা ধাক্কা দেয়। সালমাকে বলে ক্লাসে যাবে কিনা। নটা বেজে যায় সালমা ওঠেনা। তখন সালমার মা রেগে গিয়ে বলে- "কেমন মেয়ে যে পেটে ধরেছি বাবা! আমার সাত জন্ম উদ্ধার করে ছাড়ল" (হোসেন ১৩) ।

ওপরের উদ্ধৃতিটির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় সালমা একটা কথাও শোনেনা তার মায়ের। এই জন্মে তোমাকে হোগাই এমনকি মায়ের সাত জন্ম জ্বালিয়ে খাবে সে। এই উক্তি কেউ যখন করে তখন ভীষণ বিরক্ত হয়ে এবং রেগে করে। আসলে সাত জন্ম তো দেখা সম্ভব না। এটা একটা লোক বিশ্বাস যে এই জন্মের পরেও

অন্য জন্ম আছে, সালমার মা জন্মান্তরে বিশ্বাস করে এই উক্তি তা প্রমাণ করে। আরেকটি জায়গায় দেখা যায় সালমা খাওয়া-দাওয়া থেকে ঘুমকে বেশি পছন্দ করে। সালমা ঘুমোতে পারলেই সুখী। ইচ্ছে করে বেশি ঘুমানোর সে চেষ্টা করে কিন্তু সে পারেনা –"ঘুমের উপর ওর নাকি আশ্চর্য দখল। ইচ্ছে করলে দু মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে যেতে পারে। ঘুমোবার আগে পাঁচটার সময় উঠব মনে করে যদি ঘুমোয় ঠিক পাঁচটায় ঘুম ভেঙ্গে যায়" (হোসেন ১৩) ।

ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে লোকবিশ্বাসকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। পদশব্দ উপন্যাসে দেখা যায় সালমা ছোটবেলা থেকেই ক্লাসের কাউকে পাত্তা দেয় না। কারো সঙ্গে কথাও বলে না। সব সময় হাসি-ঠাট্টায় মাতিয়ে রাখে সে। অনেকে অপছন্দ করলেও, কেউ কেউ তাকে আবার পছন্দ করে। একথাই বলা যায় যখন যেমন খুশি তখন তেমন। সালমার বাবা সালমাকে ছাড়া কিছু বুঝতে চাই না, তা সালমা জ্ঞান হবার পর থেকেই এটা অনুভব করেছে। সে রকিবকে বলেছে –

> সালমা হবার পর বাবার নাকি চাকরিতে উন্নতি হয়েছিল প্রচন্ডভাবে ভাগ্যে বিশ্বাসী বাবাকে গণক বলেছিল, 'এই মেয়ে আপনার জন্য ভাগ্য বয়ে নিয়ে এসেছে।' এ যেদিন ঘর ছাড়বে তারপর আপনার একটা অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে। (হোসেন ১৩)

'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮২) উপন্যাসে লোকবিশ্বাস খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। লোক মানসজাত পূর্ব প্রচলিত কাকতালীয় ঘটনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় লোকবিশ্বাসে। যুক্তির থেকে এখানে আবেগ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উপন্যাসের চরিত্ররা যখন দলবল নিয়ে শিকারে বের হয় তখন তারা বলে- "অত বড় মাছ যখন দেখেছি নিশ্চয়ই আমাদের যাত্রা আজ শুভ" (হোসেন ৯) । দেখা যায়, নৌকা করে জলপথে তিন মাইল পথ পেড়িয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে তারা যাত্রা করে। তাদের গন্তব্যস্থলে যাবার পথে শুভ অশুভ সম্পর্কে এই মন্তব্যটি তারা করেছে। মাছ দেখার সঙ্গে শিকারের উদ্দেশ্য আছে কিনা, বাহ থাকলেও তার যোগ কতখানি সেটা আমরা জানি না। কিন্তু মাছ দেখে শিকারে গেলে যে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে, এই সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হয়েছে। যদিও তার এই বক্তব্যে বৈজ্ঞানিক কোন যোগ নেই। তবুও অন্যান্য চরিত্ররা এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছে। অন্য চরিত্রগুলিও তৎক্ষণাৎ এই লোকবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই আনন্দে আত্মহারা হয়েছে এবং শিকার করতে গেছে।

ডোম্বি নামক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন ঔপন্যাসিক। অন্যান্য চরিত্র গুলির মত তার বক্তব্যে ফুটে উঠেছে লোকমানসজাত নানা বিশ্বাস - অবিশ্বাস। তার পেশা নৌকা চালনা। নৌকা চালিয়ে এসে জীবিকা নির্বাহ করে। উপন্যাসে ডোম্বিকে বলতে শুনি –"কোমরে কালো সুতো পাকানো আছে। ওর বিশ্বাস এটা থাকলে আয় ভালো হয়"(হোসেন ৯) । কোমরের কালো সুতোর সাথে, অর্থের সম্পর্ক ভিত্তিহীন ব্যাপার। অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের কোন সম্পর্ক অন্তত কালো সুতোর সঙ্গে থাকতে পারে বলে আমাদের মনে হয় না। ডোম্বি এটা বিশ্বাস করে, এই বক্তব্যকে ঘিরেই তার আশা আকাঙ্ক্ষা জোরালো হয়ে ওঠে। কালো সুতো এবং রোজগার এর মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্কের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তার বক্তব্যে

কোথাও যুক্তির প্রাধান্য নেই। অথচ সে তার বিশ্বাসে দৃঢ়বদ্ধ। তাই সে কোমরে কালো সুতো আছে বলে, ভালো আয় হবে এই চিন্তা সে করেছে। তাছাড়া আমাদের গ্রামবাংলায় এখনো কালো রঙকে ঘিরে লোক বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। মনে বিশ্বাস কালো বস্ত্র পড়ে কোন শুভ কাজে যাওয়া যায় না তাতে অমঙ্গল হয়। এছাড়াও আমাদের বর্তমান সমাজেও নানারকম সুখ স্বাচ্ছন্দ বাড়ানোর জন্য মানুষ গণকের কাছ থেকে নানা ধরনের পরামর্শ নিয়ে বিভিন্ন রকম ধাতব বস্তু ব্যবহার করে।

আমাদের সমাজে বিভিন্ন সংখ্যাকে কেন্দ্র করে লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। আনলাকি থারটিন, ফোরটয়েন্টি প্রভৃতি। আমাদের আলোচ্য নীল ময়ূরেরযৌবন উপন্যাসেও এমন সংখ্যা দ্বারা বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৬৪ এর কম বেশি হলে নাকি ব্যবসা ভালো চলে না। উপন্যাসে রামক্রী আর দেবকী নামক চরিত্রের মুখে এই কথা আমরা শুনতে পেয়েছি। ডোম্বি যেমন কালো সুতো কোমরে থাকায় ভালো রোজগার হবে সেই আশার প্রত্যাশী, ঠিক তেমনি রামক্রী ও দেবকী দুজনেই ৬৪ ঘড়া সাজিয়ে মদ বিক্রি করে। ৬৪র কম বা বেশি হলে তাদের ধারণা ব্যবসায় খদ্দের পাওয়া যাবে না। ৬৪ এই সংখ্যার সঙ্গে খদ্দের আগমনের কোন সম্পর্ক আছে বলে আমাদের মনে হয় না। রামক্রী, দেবকী দুজনেই বিশ্বাস করে ৬৪ ঘড়া তাদের ব্যবসার জন্য শুভ।

সমাজের প্রচলিত সংস্কার, লোকবিশ্বাসের প্রতিফলন অনিবার্যভাবে সাহিত্যে ফুটে ওঠে। কারণ সাহিত্য সমাজেরই দর্পণ। তাই সমাজের বিভিন্ন ভাবনা, চেতনা, বিশ্বাস, আচার,সংস্কার সাহিত্যে জায়গা করে নেয়। আমাদের প্রচলিত লোকমানসের সংস্কার অনুযায়ী কাক নামক পাখিটি অত্যন্ত অশুভ। লেখিকা তাঁর সৃষ্ট এই উপন্যাসেও কাককে অশুভ হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। দেশাখের বাবা তার বৌমা সুলেখাকে ভর সন্ধ্যাবেলায় কেন কাকটা চেঁচাচ্ছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। আমাদের সমাজে কাক সাধারণত মঙ্গল সাধন করে। কাকে বলা হয় ঝাড়ুদার পাখি। কাক সমাজকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু তা সত্বেও এই পাখিটির প্রতি মানুষের স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কাকের কর্কশ রব এবং রূপসৌন্দর্য না থাকার জন্য সে সমাজে মানুষের কাছে স্নেহ পায়নি। কাক ডাকার সাথে অমঙ্গল ঘটার বিশ্বাস আমাদের সমাজে পরম্পরা অনুযায়ী তৈরি হয়ে এসেছে। তাই উপন্যাসে সুলেখা ও তার শ্বশুর এই বিশ্বাস মনের মধ্যে পোষণ করেছে।

‘নীল ময়ূরের যৌবন’ উপন্যাসে যেমন সংখ্যাবাচক লোকবিশ্বাস আছে, আশা আকাঙ্ক্ষা মুলক লোকবিশ্বাস রয়েছে, কুসংস্কারগ্রস্থ লোক বিশ্বাস রয়েছে, পশু পাখিকে কেন্দ্র করে লোকবিশ্বাস, নবজাতকের জন্ম পরবর্তী সময়ে তাকে কেন্দ্র করে লোকবিশ্বাসের প্রচলন রয়েছে, নারী নির্যাতন বিষয়ক লোক বিশ্বাসের প্রচলন উপন্যাসে আছে। তার পাশাপাশি সন্তান মানত করাকে কেন্দ্র করে লোকবিশ্বাসের প্রচলন দেখা গেছে। সুদামের বউ সুলেখা পুত্র সন্তান কামনা করেছে। পিপুল গাছের গোড়ায় সপ্তাহে অন্তত দুদিন জল ঢেলে তিনবার প্রদক্ষিণ করে সে পুজো দিয়েছে পুত্র সন্তান লাভ করবার জন্য। এটা একপ্রকার লোকবিশ্বাসের উদাহরণ। সন্তান কামনা করা যেমন লোকবিশ্বাস,তেমনি বিভিন্ন ভয়-ভীতি মূলক জায়গায়

বা দুর্গম স্থানে জোরে জোরে কথা বলার মধ্য দিয়ে ভয়ভীতি কাটবে এই লোকবিশ্বাস দ্বারা দেশাখ আর বিশাখা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। এই লোকবিশ্বাস কুসংস্কারে পরিপূর্ণ নয়। এই লোক বিশ্বাসের ফলে মানুষের সমাজে কোন ক্ষতি নেই। তা বরং সমাজের ভিতু লোকের পক্ষে আত্মবিশ্বাসের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

'কালকেতু ও ফুল্লরা' (১৯৯২) উপন্যাসে লোক বিশ্বাসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। লেখিকা যেন কবিকঙ্কন চন্ডীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যের নব সংস্করণ এখানে প্রকাশিত করেছেন। এখানের কালকেতু নিজের রাজ্যের অধিকার ধরে রাখার সঙ্গে সঙ্গে যাতে তার শরীরটাও ঠিক থাকে সেজন্য নিয়মিত শরীরচর্চা করেছে। কালকেতু বলেছে–"শরীর ঠিক রাখার জন্য ও গলফ খেলে, দামি খেলা। নগরের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এ খেলা খেললে কালকেতুর মাথা যেমন খোলসা হয় শরীর তেমন ঝরঝরে লাগে" (হোসেন ১৩) । কালকেতু বিশ্বাস করে গলফ খেললে মাথা খোলসা হয় অথবা বুদ্ধি বাড়ে। আসলে এই খেলাটা একটা বিদেশি খেলা আর কালকেতু এসব কার্যকলাপ আগে থেকেই করে। সবকিছু বিদেশ থেকে নিয়ে আসে যাবতীয় সব জিনিসপত্র। তার রাজ্যে এই খেলাটি কেউ খেলে না। কালকেতু যেটাই বলবেন সব কথায় নগরের সবাইকে মানতে হবে। কালকেতু নিজের বিশ্বাস, অন্যের উপর দিয়ে চাপানোর চেষ্টা করেছে। ভাঁড়ু দত্ত নামে একটি চরিত্র উপন্যাসে রয়েছে। সে একটা বিশেষ ধরনের হাসি হাসে। সেই হাসি দেখলে নাকি কালকেতুর মঙ্গল হয় বা ভালো খবর পান। তিনি অনুভব করেন যে নিশ্চয়ই, তার আজকের দিনটা ভালো যাবে, কারন তিনি ভাঁড়ু দত্তের ঐ বিশেষ হাসিটা দেখেছেন। পরবর্তীতে চারিদিকে খবর নিয়ে দেখেন যে মঙ্গলের ঘন্টাধ্বনি বাজছে। এভাবেই একের পর এক হতে হতে কালকে তোর বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হয়। আমরা জানি হাসির সাথে মঙ্গলের কোন বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক নেই। আমাদের বর্তমান সমাজেও অনেকেই এখনো এই বিশ্বাসকে মেনে চলেন। যেমন সকালে উঠে এক চোখ দেখাতে নেই, অথবা পাড়াতে এমন একজন মানুষ আছেন যে যার মুখটা সকালে দেখলে সারাদিন কারো খারাপ যেতে পারে। এসবের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। সবকিছুই মানুষের নিজের বিশ্বাস। ছোট ছোট বিশ্বাসগুলিই জড়ো হতে হতে বিরাট আকার ধারণ করে। এসব অন্ধবিশ্বাস থেকে মানুষ কখনো বেরিয়ে আসতে চায় না বা বেরিয়ে আসতে পারে না। মানুষ যাতে এসব কিছু মুক্ত হয়ে আবার নতুন ভাবে বাঁচতে পারে তারই চেষ্টা উপন্যাসে ঔপন্যাসিক করেছেন। উপন্যাসে অন্য আর এক জায়গায় আংটির প্রসঙ্গ আছে। কোন বিশেষ আঙুলে কোন আংটি পড়লে, যে আংটি ধারণ করবে তার মঙ্গল সাধিত হবে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় উপন্যাসে যে মজিদ কালকেতুকে আংটি পড়ে সংসারে শান্তি আনার কথা বলেছেন, তার সংসারে প্রতিনিয়ত অশান্তি লেগেই আছে। সুতরাং আংটি তত্ত্বটিরও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

তাহলে দেখা গেল, যতগুলি উপন্যাস নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, সবগুলির মধ্যেই কুসংস্কার বিরাজ করেছে। এই কুসংস্কার গুলো ধীরে ধীরে লোকবিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়েছে। কোন এক বিশেষশ্রেণি তাঁদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, অবৈজ্ঞানিক কিছু নিয়ম-নীতিকে সমাজের মধ্যে গেঁথে দিয়েছেন। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, তাই সমাজের ভেতরেই তাকে থাকতে হবে, সমাজের সমস্ত নিয়ম তাকে মানতে

হবে। ঔপন্যাসিক তাঁর নিরাসক্ত দৃষ্টিতে এই কুসংস্কার গুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। সমাজের কাছে বার্তা দিতে চেয়েছেন। যাতে আগামী দিনে এ সমস্ত কুসংস্কার গুলো যাতে বন্ধ হয়। তাই যথাযথভাবে সেলিনা হোসেন লোকবিশ্বাসগুলি তাঁর উপন্যাসে সংযোজন করে, একদিকে যেমন দেশীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে এই কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

ইসলাম, জুনেজার । *লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার*, গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জুন-২০১৫।

সামীয়ুল, মফিজুল ইসলাম (সম্পাদনা) । *লোকসাহিত্যসংকলন* (২৭), বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর -১৯৭১ ।

হোসেন, সেলিনা । 'জলোচ্ছ্বাস' (১৯৭২) । *উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড)*, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি -২০১৩, বইমেলা ।

হোসেন, সেলিনা । 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬) । *উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড)*, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, বইমেলা ।

হোসেন, সেলিনা । 'পদশব্দ' (১৯৮২) । *উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড)*, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, বইমেলা ।

হোসেন, সেলিনা । 'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮২) । *নয়া উদ্যোগ* (প্রথম সংস্করণ), কলকাতা, ২০০৯ ।

হোসেন, সেলিনা । 'কালকেতু ও ফুল্লরা' (১৯৯২) । *উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড)*, প্রতিভাস, কলকাতা প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৩, বইমেলা ।